بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ মার্চ ২০১৯ মোতাবেক ০৮ আমান ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত কায়েস বিন মিহ্সান (রা.) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তার নাম হযরত কায়েস বিন হিসনও বর্ণিত হয়েছে। তিনি আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল আনীসাহ্ বিনতে কায়েস আর তার পিতা ছিলেন মিহ্সান বিন খালেদ। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তার এক মেয়ে ছিল উম্মে সা'দ বিনতে কায়েস। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার সন্তানরা মদীনায় ছিল। **{উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২২, কায়েস বিন মিহ্সান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৩, কায়েস বিন মিহ্সান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

অপর সাহাবী হলেন, হযরত জুবায়ের বিন ইয়াস (রা.)। তার পিতার নাম ছিল ইয়াস বিন খালেদ। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরায়েক-এর সদস্য ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বলেন, তার নাম ছিল জুবায়ের বিন ইলিয়াস। অপর এক বর্ণনায় তার নাম জুবায়ের বিন ইয়াসও বর্ণিত হয়েছে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৪, জুবায়ের বিন ইয়াস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ওপর নাঊযুবিল্লাহ্ কোন ইহুদী জাদু-টোনা করেছিল আর তাঁর (সা.) ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। কতেক বর্ণনায় এসেছে, চিরুনি এবং চুলের ওপর তারা জাদু করে তা যারওয়ান (নামক) কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেখানে গিয়ে তা বের করেন। সহীহ্ বুখারীর শরাহ্ (বা ভাষ্য) ফতহুল বারী'তে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জুবায়ের বিন ইয়াস (রা.) যারওয়ান কূপ থেকে সেই চিরুনি ও চুল তুলে এনেছিলেন। অপর এক বর্ণনা অনুসারে হযরত কায়েস বিন মিহ্সান (রা.) তা তুলে এনেছিলেন। **(ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী প্রণীত ফাতহুল বারী, কিতাবুত তিব, বাবুস্ সিহর, হাদীস নং: ৫৭৬৩, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৮২, করাচীর কাদীমি কুতুব খানা থেকে প্রকাশিত)**

এ কারণে এই দু'জন সাহাবীর বিবরণ আমি একত্র করেছি। তাদের মধ্য হতে যে-ই সেসব জিনিস তুলে এনে থাকুন না কেন তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আসল কথা হল, মহানবী (সা.)-এর ওপর আসলেই কোন জাদুর প্রভাব পড়েছিল কি? আসল ঘটনা কী আর এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? তা আমাদের জানা থাকা উচিত। যে কথায় মহানবী (সা.)-এর সত্তার প্রতি আপত্তি উঠতে পারে অথবা মানুষ আপত্তি করে তার উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে। তাই আমি এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি যা জামা'তের বই-পুস্তকে সংরক্ষিত আছে। এই উভয় সাহাবী (রা.)'র বরাতে আজ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা ফালাকের তফসীরের ভূমিকায় এই ঘটনা উল্লেখপূর্বক উক্ত সূরা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) (এ) সূরা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "অনেকের ধারণা হল, সূরা ফালাক ও সূরা নাস, শেষের এ দু'টি সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ আবার একে মাদানী সূরা বলে অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।"

তিনি (রা.) লিখেন, "এ দু'টি মাদানী সূরা, যারা একথার পক্ষে তাদের যুক্তি হল, এই সূরা এবং এর পরের সূরাটির সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর সেই রোগের সাথে যেক্ষেত্রে মনে করা হয়েছিল যে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাঁর (সা.) ওপর জাদু-টোনা করা হয়েছে। সে সময় এই সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয় আর তিনি (সা.) তা পাঠ করে ফুঁ দেন।" তিনি (রা.) বলেন, "একথা বলা হয় আর তফসীরকারকগণ বলেন, এই ঘটনাটি যেহেতু মদীনায় ঘটেছিল তাই সূরা ফালাক এবং সূরা নাস্ মাদানী সূরা। যাহোক, এ বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সূরা দু'টি মাদানী সূরা" অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, "এটি তফসীরকারকদের একটি যুক্তি, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নয়। যদিও আমাদের কাছেও এরূপ কোন অকাট্য সাক্ষ্য নেই যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, এগুলো মক্কী সূরা। কিন্তু যে যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা-ও দুর্বল।" এটি অসাড় যুক্তি। "কেননা এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হলেও তো মহানবী (সা.) অসুস্থাবস্থায় এটি পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁ দিতে পারতেন। কাজেই শুধুমাত্র ফুঁ দেওয়ার কারণে এটি মনে করা যে, এগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ যুক্তি যথার্থ নয়।"

"... মহানবী (সা.)-এর অসুস্থ হওয়া আর মানুষের এটি মনে করা যে, তাঁর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু-টোনা করা হয়েছে- এ ঘটনাটি যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে সেই বাক্যাবলী হল", হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সূরার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যে শব্দমালা লিপিবদ্ধ করেছেন তাহল, তিনি (রা.) লিখেন, "...তফসীরকারকগণ যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.)'র রেওয়ায়েতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এ জন্য আমরা শুধুমাত্র এই রেওয়ায়েতটির অনুবাদ করছি।" হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু-টোনা করা হয়েছে আর এর এতটাই প্রভাব পড়েছে যে, তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ তিনি সেই কাজ করেন নি। একদিন অথবা এক রাতে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করেন, আবার দোয়া করেন, পুনরায় দোয়া করেন এরপর বলেন, **হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমি যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে দান করেছেন**। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি যা যাচনা করেছিলেন তা কী?" আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কী দিয়েছেন? "তখন উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, "আমার কাছে দু'ব্যক্তি আসেন এবং তাদের একজন আমার শিয়রে আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে। এরপর সেই ব্যক্তি যে আমার শিয়রে বসেছিল সে আমার পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্বক বলে অথবা সম্ভবত একথা বলে," {হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অথবা একথা বলে} "পায়ের কাছে বসা ব্যক্তি শিয়রে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্)" (সা.)-"এর কী কষ্ট? তখন দ্বিতীয়জন উত্তর দেয়, (তাকে) জাদু-টোনা করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, কে জাদু করেছে? তখন সে উত্তরে বলে, ইহুদী লবীদ বিনুল আ'ছাম করেছে। তখন প্রথমজন বলে, কি দিয়ে জাদু করা হয়েছে? আর দ্বিতীয়জন উত্তর দেয়, চিরুনি এবং মাথার চুল দিয়ে, যা খেজুরগুচ্ছের মাঝে রয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয়জন বলে, এগুলো যী-উরওয়ান-এর কূপে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)" এরপর "তাঁর সাহাবীদের (রা.) নিয়ে সেই কূপের কাছে যান" এবং ফিরে এসে "পুনরায় বলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌র কসম! কূপের পানিকে মেহেদীর রসের মত লাল দেখাচ্ছিল।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর এর

ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "(মনে হয় ইহুদীদের মধ্যে এই প্রচলন ছিল যে, যখন তারা কারো ওপর জাদু-টোনা করতো তখন মেহেদী বা এই ধরণের কোন বস্তু পানিতে মিশিয়ে দিত এটি বুঝানোর জন্য যে, জাদুবলে" এই "পানিকে লাল করা হয়েছে।)" এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য একটি বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতো। এরপর তিনি (রা.) বলেন, "আর সেখানকার খেজুরগুলো এমন ছিল" মহানবী (সা.) বলেন, "যেন শয়তান অর্থাৎ সাপের মাথার মতো। (এক্ষেত্রে খেজুর-ছড়াকে সাপের মাথার সদৃশ বলা হয়েছে, অর্থাৎ থোকা থোকা খেজুর ছিল।) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যেগুলোর ওপর জাদু করা হয়েছিল আপনি সেই জিনিসগুলো পুড়িয়ে দিলেন না কেন? মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আমাকে আরোগ্য দান করেছেন তাই আমি এমন কোন কাজ করা পছন্দ করি নি যদ্বারা অনিষ্ট মাথাচাড়া দেয়...,তাই আমি সেসব বস্তু পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব তা পুঁতে ফেলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.)'র বর্ণনা সম্পর্কে {হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন}, যে দু'জন পুরুষের উল্লেখ রয়েছে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। সম্ভবত তারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন, যাদেরকে মহানবী (সা.) দেখেছেন। তারা যদি মানুষ হতেন তাহলে হযরত আয়েশা (রা.)ও তাদের দেখতে পেতেন।" তিনি (রা.) বলেন, "হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক যা বর্ণিত হয়েছে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন, ইহুদীরা তাঁর ওপর জাদু-টোনা করেছে। এর অর্থ এটি নয় যে, যেভাবে জাদুর প্রভাব পড়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছিল।" এরপর তিনি (রা.) বলেন, "...মহানবী (সা.) যখন তাদের জাদু-টোনার বস্তু (কূপ) থেকে উঠিয়ে পুঁতে ফেলেন তখন ইহুদীরা মনে করে, তারা যে জাদু-টোনা করেছিল তা অকার্যকর হয়ে গেছে" বা শেষ হয়ে গেছে। "অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আরোগ্য"ও "দান করেন। সারকথা হল, ইহুদীরা এ বিশ্বাস করত যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর তারা জাদু-টোনা করেছে। এ কারণে স্বভাবতই তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকে যে, তিনি অসুস্থ হবে যাবেন।" তিনি (রা.) বলেন, "...এই বিবরণ থেকে যেখানে ইহুদীদের সেই শত্রুতার কথা জানা যায় যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের ছিল, সেখানে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়; মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল ছিলেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে সেসব বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে যা ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে করছিল। অতএব অদৃশ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর (সা.) জ্ঞাত হওয়া আর নিজেদের দুরভিসন্ধিতে ইহুদীদের ব্যর্থ হওয়া তাঁর (সা.) সত্য রসূল হওয়ার সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল দলিল।" **(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯-৫৪২)**

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে এর অর্থ করেছেন সেটিই সঠিক অর্থাৎ, ইহুদীরা নিজেদের ধারণানুসারে মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করেছিল কিন্তু এর কোন প্রভাব পড়ে নি। আর অসুখটি ছিলো বিস্মৃতির রোগ অথবা যে অসুখই হোক না কেন এর অন্য কোন কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জ্ঞাত করে বাহ্যিকভাবেও তাদের যে ধারণা ছিল যে, তারা জাদু করেছে তারও অপনোদন করেছেন। এছাড়া তাঁর (সা.) অসুস্থতা দেখে ইহুদীরা যে নিজেদের ধারণানুসারে আনন্দিত হচ্ছিল বা একথা রটিয়ে দিয়েছিল, অর্থাৎ একথা বলত যে, আমাদের জাদুর প্রভাবেই এই রোগ দেখা দিয়েছে– এর রহস্যও উন্মোচিত হয়।

এরপর আমাদের সাহিত্যে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র একটি প্রবন্ধ রয়েছে, যাতে এই ঘটনা সম্পর্কে সবিস্তারে ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই ঘটনাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে। তিনি (রা.) লিখেন,

ইতিহাস ছাড়া বিভিন্ন হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর ওপর (নাঊযুবিল্লাহ্) একবার ইহুদী বংশজূত এক মুনাফিক লবীদ বিনুল আ'ছাম জাদুমন্ত্র করেছিল (অথবা জাদু-টোনা করেছিল।) আর এই জাদু এভাবে করা হয় যে, একটি চিরুনিতে চুল গিঁট দিয়ে এবং এর ওপর কিছু পড়ে তা একটি কূপের মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। আর বলা হয়, {তিনি (রা.) বলেন, বলা হয়–} নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) দীর্ঘদিন এই জাদুতে আক্রান্ত ছিলেন। (তারা এই গুজব রটিয়ে দিয়েছিল।) এ সময়কালে তিনি (সা.) অধিকাংশ সময় উদাস এবং মনমরা হয়ে থাকতেন আর শঙ্কিত হয়ে বার বার দোয়া পড়তেন এবং এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল, সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) অনেক বেশি বিস্মৃতি রোগে ভুগছিলেন। (কোন কোন বিষয় তিনি ভুলে যেতেন।) এমনকি অনেক সময় তিনি মনে করতেন, আমি অমুক কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু আসলে তিনি সেই কাজটি করেন নি। অথবা অনেক সময় তিনি মনে করতেন, আমি আমার অমুক স্ত্রীর ঘর থেকে হয়ে এসেছি কিন্তু আসলে তিনি তার ঘরে যান নি। {এর ব্যাখ্যায় তিনি (রা.) বলেন,} এ সম্পর্কে এটি স্মরণ রাখতে হবে, মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য পালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন আর সবশেষে সেই স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন যার সেদিন পালা হতো। উপরোক্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (যাহোক, এই বিবরণ চলছে।) অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হল সারকথা যা পূর্বেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এটি বুখারীর হাদীস, যার সারাংশ তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, এই হল, সেই বর্ণনার সারমর্ম যা ইতিহাস এবং হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনাকে ঘিরে এমন সব কল্প-কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে যে, আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটন করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। (এই রেওয়ায়েতকে ভিত্তি করে এমন এমন আজগুবি গল্প রচনা করা হয়েছে যে, আসল ঘটনা উদ্ধার করাই দুরূহ এখন হয়ে পড়েছে।) তিনি (রা.) লিখেছেন, যদি এসব রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হয় তাহলে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র এবং কল্যাণময় সত্তা এরূপ প্রমাণিত হয় যেন তিনি একজন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যাকে নিদেনপক্ষে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হলেও তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা স্বীয় জাদুবলে যে ধাঁচে চাইতো গড়তে পারতো। আর এভাবে তারা তাঁকে নিজেদের অপবিত্র মনোযোগের লক্ষ্যে পরিণত করে তাঁর (সা.) হৃদয় ও মস্তিষ্ককে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করত, আর নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) এই জাদুর মোকাবিলায় নিজেকে অসহায় অবস্থায় পেতেন। (এই রেওয়ায়েতটিকে যদি এভাবে বর্ণনা করা হয় যেভাবে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তাহলে এমন ফলাফল দাঁড়াবে যা একেবারেই ভুল, এমনটি হতেই পারে না।) কিন্তু যদি এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও যথার্থরূপে চিন্তা করা হয় আর গবেষণাধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, (রীতিমত যদি গবেষণা করা হয় আর অনুসন্ধান করা হয়) তাহলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, এটি শুধুমাত্র বিস্মৃতির একটি রোগ ছিল, যাতে

সাময়িক বিভিন্ন শঙ্কা বা উদ্বেগ এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে কিছু সময়ের জন্য তিনি (সা.) আক্রান্ত হয়েছিলেন, যাকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় পরশ্রীকাতর শত্রু একথা চাউর করে দিয়েছিল যে, আমরা মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু করেছি, নাঊযুবিল্লাহ্। কিন্তু খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-কে আশু আরোগ্য দান করে শত্রুদের মুখ কালো করে দিয়েছেন আর কপটদের মিথ্যা অপপ্রচার ধুলোয় মিশে গিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে শয়তানী শক্তির ওপর মহান বিজয়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.), যার চেয়ে বড় তাগুতী বা শয়তানী শক্তিসমূহের মুণ্ডপাতকারী না আজ পর্যন্ত কেউ জন্ম নিয়েছে আর না ভবিষ্যতে কেউ জন্ম নিবে, তাঁর সম্পর্কে এটি মনে করা যে, তিনি (সা.) এক লাঞ্ছিত ইহুদীর শয়তানী জাদুর লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন, এটি মানব-বুদ্ধির চরম অপব্যবহার, (এটি চিন্তাও করা যেতে পারে না,) আর এটি শুধু আমাদের দাবিই নয় বরং স্বয়ং বিশ্বজগতের নেতা (যার জন্য আমার প্রাণ নিবেদিত) তিনিও এটি রদ করেছেন।

একটি হাদীসের আলোকে এটি সুস্পষ্ট হয়। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। {অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন যে, আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে।} আমি জিজ্ঞেস করি, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান লেগে আছে? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। হযরত আয়েশা (রা.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সাথেও কি কোন শয়তান লেগে আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ; কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে শয়তানের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, এমনকি আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাব, সিফাতিল কিয়ামাতে ওয়াল জান্নাতে ওয়ান্নার, বাব তাহরিশুশ্ শায়তান)**

এরূপ সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল বক্তব্য থাকার পরও কি এই ধারণা করা যেতে পারে যে, কোন কপট ইহুদী, (পবিত্র কুরআনের আলোকে এক কোপগ্রস্ত জাতীও বটে)– নিজের শয়তানের সাহায্যে মহানবী (সা.)-এর মতো সুমহান মর্যাদার অধিকারীর ওপর জাদু-টোনা করবে আর তিনি (সা.) সেই শয়তানী জাদুতে প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শোকার্ত ও অসুস্থ থাকবেন?

মিথ্যাবাদীরা সকল যুগেই সত্যের মোকাবিলায় এমন মিথ্যা ও অসাড় অস্ত্র প্রয়োগ করে এসেছে, কিন্তু মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী খোদা এমন সব মিথ্যার জাল ছিন্ন করেছেন বা গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন, যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (সূরা আল্ মুজাদেলাহ্: ২৩)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি লিখে রেখেছেন আর নির্ধারণ করে রেখেছেন, সকল রসূলের যুগে আমি এবং আমার রসূলই বিজয়ী হব। আর কোন শয়তানী ষড়যন্ত্র আমাদের মোকাবিলায় সফল হতে পারবে না।

তিনি (রা.) লিখেন, তাহলে এই প্রশ্ন জাগে, সেই ঘটনার বাস্তবতা কী যা সহীহ্ বুখারীতে পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা.)'র বরাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে? অতএব যদি ঘটনার পূর্বাপর এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রণিধান করা হয় তাহলে এই ঘটনার বাস্তবতাকে বোঝা বা অনুধাবন করা খুব একটা কঠিন থাকে না। সর্বপ্রথম এটি জেনে রাখা উচিত, ধারণাপ্রসূত জাদুর এই ঘটনাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ একথা লেখা আছে, যাতে মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে

কুরাইশদের বাঁধা দেওয়ার কারণে বাহ্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়। এই আপাত ব্যর্থতা এমন এক আঘাত ছিল যার কারণে কাফির এবং মুনাফিকরা তো হাসিঠাট্টা এবং বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করারই ছিল, কিন্তু কতিপয় নিষ্ঠাবান মুসলমান, এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র মতো উন্নত মানের বুযুর্গও এই আপাত ব্যর্থতার কারণে সাময়িকভাবে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন। {হযরত উমর (রা.) সম্পর্কিত এই হাদীসটি বুখারীতে রয়েছে} বুখারীতে এটিও লেখা আছে, এমন পরিস্থিতির ফলে দুর্বল চিত্তের লোকদের পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার দুশ্চিন্তায় মহানবী (সা.)-এর ওপর স্বভাবতই মানসিক চাপ ছিল এবং কিছুদিন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর স্বভাবতই এই দুশ্চিন্তার প্রভাব তাঁর (সা.) স্বাস্থ্যের ওপরও পড়েছে। আর এই দুশ্চিন্তার ফলে তিনি (সা.) খোদা তা'লার সমীপে অনেক বেশি দোয়াও করতেন, যেমনটি হাদীসের শব্দ **'দাআ ওয়া দাআ'**-তে ইঙ্গিত রয়েছে, যেন হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার কারণে ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে কোন সাময়িক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয়। এটি সেরূপ দোয়াই ছিল যেমনটি তিনি (সা.) বদরের প্রান্তরে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যকে দেখে করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ।

এসব কারণে তাঁর (সা.) স্নায়ু এবং স্মরণশক্তির ওপর গভীর প্রভাব পড়েছিল আর তিনি কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। {কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এটি এক, দুই বা চার দিন হবে, অথবা দুই দিন হবে কিংবা এক দিন ও এক রাতের জন্য হবে, কিন্তু যাহোক, যত দিনের জন্যই হোক, কিছুটা প্রভাব পড়েছে, যা এক আবশ্যকীয় প্রভাব ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ফলাফল দাঁড় করেছেন যে, তা কয়েক দিনের জন্য ছিল আর এর কারণ ছিল সেই দুশ্চিন্তা যা মুসলমানদের ঈমানে দুর্বলতার আশঙ্কার কারণে তাঁর (সা.) ছিল,} এটি এক আবশ্যকীয় মানবিক দিক যা থেকে খোদার নবীরাও মুক্ত নন। ইহুদী এবং মুনাফিকরা যখন এটি দেখে যে, মহানবী (সা.) আজকাল অসুস্থ আছেন আর স্নায়ু ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে তিনি বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত, তখন তারা বদভ্যাস অনুযায়ী নৈরাজ্যের উদ্দেশ্যে এ কথা রটনা করতে আরম্ভ করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্! আমরা মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু-টোনা করেছি, আর তাঁর (সা.) এই বিস্মৃতির রোগ সেই জাদুরই পরিণাম। সেইসাথে তারা তাদের পুরোনো রীতি অনুযায়ী বাহ্যিক আলামত হিসেবে কোন চিরুনিতে চুলের গিঁট ইত্যাদি দিয়ে একটি কূপের মধ্যে তা পুঁতে রাখে।

তাদের এই ধারণাপ্রসূত জাদুর সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে, তিনি (সা.) এই নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে আরো দোয়া করেন। {আর যেমনটি হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, এই সংবাদ লাভের পর তিনি এক দিন বা এক রাত অনেক বেশি দোয়া করেন।} আর নিজের ঊর্ধ্বলোকের প্রভুর কাছে যাচনা করেন যেন তিনি এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর নাম এবং তার ধারণাপ্রসূত এই জাদুর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন যাতে তিনি (সা.) এই মিথ্যা জাদুকে সমূলে উৎপাটন করতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) ব্যকুলচিত্তের দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন আর স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর (সা.) কাছে এর প্রকৃত বিষয় উন্মোচন করেন।

পবিত্র কুরআনের নীতিগত শিক্ষা হল, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {অর্থাৎ নবীদের বিপরীতে কোন জাদুকর কোন পরিস্থিতিতেই সফল হতে পারে না, তা সে যেভাবে আর যে

দিক থেকেই আক্রমন করুক না কেন, (সূরা তাহা: ৭০)}। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের এই অকাট্য সিদ্ধান্তের আলোকে যে, يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৮) অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীরা বলে, তোমরা কেবল এমন একজনের অনুবর্তিতা করছ যে জাদুগ্রস্ত। পবিত্র কুরআনে লেখা আছে, কাফিররা একথাই বলেছিল। এছাড়া স্বয়ং এই হাদীসের শব্দাবলী ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং আরবী প্রবাদের প্রতি প্রণিধান করলে বুখারীর এই বর্ণনাটি নিশ্চিতরূপে **'হাকায়েত আনিল গায়র'** রূপে ধরে নিতে হবে। **'হাকায়েত আনিল গায়র'**-এর অর্থ হল, বাহ্যত বক্তা নিজের পক্ষ থেকে কথা বললেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, অন্যরা এই কথা বলে, অর্থাৎ অপরের কথা বর্ণনা করা হয়। এভাবে এই রেওয়ায়েত যাতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করা হয়-{এর অর্থ হল, শত্রুরা এ কথা রটনা করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু-টোনা করা হয়েছে,} হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং এ কথা বলেন নি। অর্থাৎ এর অনুবাদ হবে, শত্রুরাই এ কথা রটনা করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু করা হয়েছে। এমনকি সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তা করেন নি। অপর এক বর্ণনায় এটিও রয়েছে, তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন, আমি আমার অমুক স্ত্রীর গৃহে গিয়েছিলাম, অথচ তিনি সেই স্ত্রীর গৃহে যান নি। হযরত আয়েশা (রা.)'র বক্তব্য অনুসারে সেই দিনগুলোতেই তিনি (সা.) একদিন আমার গৃহে ছিলেন, আর দুশ্চিন্তার কারণে তিনি বারংবার আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলেন। সেই দোয়ার পর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেই কথা অবহিত করেছেন যা আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই কথাটি কী? তিনি (সা.) বলেন, (স্বপ্নে বা কাশ্‌ফের অবস্থায় আমার কাছে) দু'ব্যক্তি আসে। তাদের একজন আমার শিয়রে উপবিষ্ট হয় আর অপরজন আমার পায়ের কাছে আসন গ্রহণ করেন। এরপর তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তির কী কষ্ট? হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, তাদের কথা বলার ভঙ্গিও **'হাকায়েত আনিল গায়র'** অর্থাৎ অন্যের বরাতে কথা বলার দিকে ইঙ্গিত করছে। আর এরপর সেই দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কষ্ট হল অমুক ইহুদী (তাঁর ওপর) জাদু করেছে আর লোকেরা বলছে, এটি তারই প্রভাব। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের পর তিনি নিজের কয়েকজন সাহাবীর সাথে সেই কূপের কাছে যান এবং তা পর্যবেক্ষণ করেন। তাতে কয়েকটি খেজুর গাছ উদগত হয়েছিল (অর্থাৎ সেটি একটি অন্ধকার কূপ ছিল)। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে ফিরে আসেন এবং তাকে বলেন, হে আয়েশা! আমি সেটি দেখে এসেছি। এই কূপের পানি মেহেদী (মিশ্রিত) পানির ন্যায় লাল রঙ ধারণ করছে। (ইহুদীদের রীতি ছিল, মানুষকে প্রতারিত করার জন্য, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এভাবে কূপের পানি রাঙিয়ে দিত) আর তা খেজুর বৃক্ষ বা যাক্কুম বৃক্ষের ন্যায় কুৎসিত দেখা যেতো। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, আপনি সেই চিরুনি ইত্যাদি বাইরে বের করে ফেলে দেন নি কেন? কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, জ্বালিয়ে বা পুড়িয়ে দেননি কেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আরোগ্য দান করেছেন, তাহলে আমি তা বাইরে নিক্ষেপ করে লোকদেরকে একটি মন্দ বিষয়ে চর্চা করার (সুযোগ) কেন দিব? (যার কারণে দুর্বল চিত্তের মানুষের মাঝে

অযথা জাদুর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল।) অতএব মাটিচাপা দিয়ে সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, স্মরণ রাখা উচিত, **'হাকায়েত আনিল গায়র'** (অর্থাৎ অন্যের বরাতে যখন কথা বলা হয় অথবা অন্যের কথাকে যখন পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়,) আরবদের মাঝে এভাবে কথা বলার রীতি প্রচলিত ছিল, বরং পবিত্র কুরআনেও কোন কোন স্থানে এই বাচনভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব এক স্থানে জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (সূরা আদ্ দুখানঃ ৫০) অর্থাৎ হে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি! তুমি খোদার এই শাস্তি ভোগ কর, যদিওবা তুমি অনেক সম্মানিত ও ভদ্র ব্যক্তি।

এখানে এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামবাসীদেরকে সম্মানিত ও ভদ্র মনে করেন, বরং **'হাকায়েত আনিল গায়র'** অনুযায়ী এর অর্থ হল, হে সেই ব্যক্তি! যাকে তার সঙ্গী-সাথি এবং সে নিজেও সম্মানিত এবং ভদ্র মনে করতো, (পৃথিবীতে মন্দ কাজ করার পর মনে করতো, আমরা অনেক সম্মানিত,) তুমি এখন খোদার আগুনের শাস্তি ভোগ কর। হুবহু সেই একই ভঙ্গী এই স্বপ্নে সেই দুই ব্যক্তি বা দুই ফিরিশ্তা অবলম্বন করেছে, যাদেরকে মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন। অতএব তারা যখন এই কথা বলেছে যে, এই ব্যক্তির ওপর জাদু করা হয়েছে, তখন তাদের কথার অর্থ এটি ছিল না যে, আমাদের ধারণা অনুযায়ী জাদু করা হয়েছে, বরং এর অর্থ ছিল- মানুষ বলে যে, তাকে জাদু করা হয়েছে। আর স্বপ্নের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, এই কুচক্রীরা সেই কূপে যে জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল এবং যার মাধ্যমে তারা স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতারিত করত। (অর্থাৎ সমমনা লোকদের ধোঁকা দিচ্ছিল এবং গুজব ছড়াচ্ছিল, মুনাফিকদের মাঝে মিথ্যাচার করছিল), সেটি যেন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর কাছে প্রকাশ করে দেন, যেন তাদের ধারণাপ্রসূত জাদুকে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। অতএব এমনটিই হয়েছে, তাদের জাদুর (জন্য ব্যবহৃত) হাতিয়ারকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে আর সেই কূপটি মাটিচাপা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর এর আবশ্যিক ফলাফলরূপে মহানবী (সা.)-এর এই প্রকৃতিগত দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যায় যে, দুষ্কৃতিপরায়ণরা এরূপ দুষ্টামি করে সরল প্রকৃতির লোকদের প্রতারিত করতে চায়। আর এই ঐশী প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হয় যে, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (সূরা তাহাঃ ৭০)। অর্থাৎ এক জাদুকর যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সে খোদার এক নবীর মোকাবিলায় কখনো সফল হতে পারবে না।

যাহোক, উপরোক্ত হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়-

প্রথমতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার কারণে প্রকৃতিগতভাবে মহানবী (সা.) অন্যদের হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি গৃহস্থালী বিষয় সম্পর্কিত জাগতিক অনেক বিষয় ভুলে যেতেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর (সা.) এই অবস্থা দেখে ইহুদী এবং মুনাফিকরা, যারা সর্বদা এমনসব বিষয়কে পুঁজি করে ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার দুর্নাম করতে চাইতো, এই গোপন প্রচারণা আরম্ভ করে যে, আমরা নাঊযুবিল্লাহ্ মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু করেছি। তাদের এই রটনা তেমনই ছিল যেমনটি তারা বনী মুসতালিক-এর যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.)'র পেছনে রয়ে যাওয়ার কারণে তার দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করেছিল আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবন অতিষ্ঠ করার নোংরা অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ ধারণাপ্রসূত এই জাদুর বাহ্যিক আলামত হিসেবে, যেন সরল প্রকৃতির মানুষকে আরো সহজে প্রতারিত করা যায়, এই দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকেরা ইহুদী বংশীয় এক মুনাফিক লবীদ বিনুল আছেম এর মাধ্যমে নিজেদের রীতি অনুযায়ী একটি চিরুনিতে কিছু চুল পেঁচিয়ে সেটিকে কূপের মাঝে পুঁতে রাখে আর এটি নিয়ে গোপন রটনা আরম্ভ হয়ে যায়, যা মহানবী (সা.)-এর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির কারণ হয়।

চতুর্থতঃ এর জন্য মহানবী (সা.) বিগলিত চিত্তে খোদা তা'লার সমীপে দোয়া করেন, হে খোদা! তুমি নিজ কৃপায় এই নৈরাজ্যকে প্রতিহত কর আর আমার কাছে এর বাস্তবতা প্রকাশ কর যেন আমি এই নৈরাজ্যের অপসারণ করে সরল প্রকৃতির মানুষগুলোকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

পঞ্চম বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) সেই দোয়া কবুল করেন আর লবীদ বিনুল আছেম এর ষড়যন্ত্রের গোমড় ফাঁস করে দেন। তখন তিনি (সা.) কয়েকজন সাক্ষীকে সাথে নিয়ে সেই কূপের কাছে যান আর সেই চিরুনিকে মাটিচাঁপা দেন বরং সেই কূপটিকেও বন্ধ করে দেন যেন বাঁশও না থাকে আর বাঁশিও না বাজে।

বাকি রইল এই প্রশ্ন, মহানবী (সা.), যিনি খোদা তা'লার এক মহামর্যাদাবান নবী বরং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামান্ নবীঈন ছিলেন, তিনি বিস্মৃতির রোগে কেন আক্রান্ত হলেন, যা বাহ্যত নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে? এর উত্তরে ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক নবীর দু'ধরনের ব্যক্তিত্ব থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খোদার নবী এবং রসূল হয়ে থাকেন, যার কারণে তিনি খোদার বাণী লাভের সম্মানে ভূষিত হন, আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে নিজ অনুসারীদের ওস্তাদ বা শিক্ষক আখ্যায়িত হন এবং তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হন। আর অপর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের মাঝ থেকে কেবল একজন (রক্তমাংসের) মানুষই হয়ে থাকেন। আর সকল প্রকার মানবিক চাহিদা ও প্রকৃতিগত বিপদের অধীনস্ত হয়ে থাকেন যা অন্যান্য মানুষের জীবনে যুক্ত আছে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ (সূরা আল্ কাহ্ফঃ ১১১) অর্থাৎ হে রসূল! তুমি মানুষকে বলে দাও, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ (আর সেসব নিয়মের অধীনস্ত যা অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত)। তবে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই খোদা তা'লার এক রসূলও বটে। আর খোদার পক্ষ থেকে খোদার সৃষ্টির হিদায়েতের জন্য ওহী এবং এলহাম প্রাপ্ত হয়েছি। এটি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ।

এই সূক্ষ্ম আয়াতটিতে নবীদের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বা সত্তাকে অতি উন্নতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক দিক থেকে তাদেরকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র করা হয়েছে আর অপর দিক থেকে তাদেরকে সাধারণ মানুষের গণ্ডি থেকে বাহিরে বের হতে দেয়া হয় নি। অতএব যে ব্যক্তি মনে করে, নবীরা মানবিক চাহিদা ও প্রকৃতিগত বিপদের ঊর্ধ্বে থাকে, সে মিথ্যাবাদী। নিশ্চিতরূপে নবীরাও সেভাবেই রোগাক্রান্ত হন যেভাবে সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয়। হযরত মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড, (প্রসঙ্গক্রমে এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্যিক যেসব আলামতের উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী হাদীস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।) ফুসফুসের সংক্রমণ, ক্ষয়-জ্বর, শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি, গেঁটেবাত, মাথাঘোরা, স্নায়ুবিকার, অতিসংবেদনশীলতা, হতাশা, অস্থিরতা, মানসিক আঘাত, বিস্মৃতি, বিপদাপদে নিপতিত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত আঘাত, ক্ষত, যুদ্ধাহত ইত্যাদি সবকিছুর কবলেই

একজন নবী নিপতিত হতে পারে এবং নিপতিত হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র যদি কোন বিশেষ নবীকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমীভাবে কোন বিশেষ ব্যাধি থেকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যদি এখানে কারো এই ধারণা জাগে যে, পবিত্র কুরআন তো মহানবী (সা.) সম্পর্কে ঘোষণা করেছে, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (সূরা আল্ আ'লাঃ ৭)। (অর্থাৎ আমরা তোমাকে এমন এক শিক্ষা প্রদান করব যা তুমি বিস্মৃত হবে না)। এর উত্তরে ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত, এই প্রতিশ্রুতি কেবল কুরআনী ওহী সম্পর্কে দেয়া হয়েছে, সাধারণভাবে নয়। আর এর অর্থ হল, হে রসূল! আমরা নিজেদের যে ওহী তোমার প্রতি উম্মতের হিদায়েতের জন্য অবতীর্ণ করব তা তুমি বিস্মৃত হবে না। আর আমরা কিয়ামত পর্যন্ত তার সুরক্ষা করব। এই প্রতিশ্রুতি আদৌ সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়াদি আর জাগতিক কাজকর্ম অথবা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক রীতিনীতি সম্পর্কে নয়। অতএব হাদীস থেকেও প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলে যেতেন। বরং হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে, তিনি কখনো কখনো নামায পড়ানোর সময় রাকাতের সংখ্যাও ভুলে যান আর মানুষ তাকে স্মরণ করানোর পর তার স্মরণ হয়। বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আরো অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভুলে যেতেন।

বরং হাদীসে মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي। (আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাবু ইযা সাল্লা খামসান) অর্থাৎ আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আর যেভাবে কখনো কখনো তোমরা ভুলে যাও, অনুরূপভাবে আমিও ভুলতে পারি। অতএব আমি যদি কোন বিষয় ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।

কাজেই যেভাবে মহানবী (সা.) কখনো কখনো সাধারণ ও সাময়িক বিস্মৃতির শিকার হতেন, অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছু সময়ের জন্য তিনি বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অতএব এটিই সেই ব্যাখ্যা যা জাদু সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সম্পর্কে অতীতের কতিপয় আলেম করেছেন। যেমন আল্লামা মাযারীঈ বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সত্যতার পক্ষে অগণিত অকাট্য দলীল রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীও তাঁর সত্যতার সাক্ষী। এছাড়া সাধারণ জাগতিক বিষয়াদি, যার জন্য তিনি প্রেরিত হন নি, সেক্ষেত্রে এটি কোন রোগের প্রকোপ ধরে নিতে হবে যেভাবে কোন মানুষ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়।

আর আল্লামা ইবনুল কাস্সার বলেন,

মহানবী (সা.)-এর এই যে সাময়িক বিস্মৃতির রোগ হয়েছিল তা অন্যান্য রোগের মতই একটি রোগ ছিল যেমনটি হাদীসের শেষ শব্দাবলী থেকে বুঝা যায়, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। (হাদীসে এটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে)।

সারকথা হল, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর উপরোল্লিখিত অবস্থা, যেটিকে শত্রুদের জাদুর ফলাফল আখ্যা দেয়া হয়েছে, তা মোটেই কোন জাদু-টোনা ইত্যাদির প্রভাব ছিল না। বরং উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী কেবলমাত্র বিস্মৃতির একটি রোগ ছিল, যেটিকে কতিপয় নৈরাজ্যবাদী লোক মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। পবিত্র কুরআন নবীদের ওপর জাদু করার গল্পকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। মানুষের বিবেকও তা গ্রহণ করে না। হাদীসের শব্দাবলী এটিকে কেন্দ্র করে রচিত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে। আর স্বয়ং সৃষ্টির সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর উন্নত মর্যাদা জাদু সংক্রান্ত এই ঘটনার মূলোৎপাটন করছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, আর এ কথাও বৃথা হবে না, যেমনটি কিনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে, (তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখনকার কথা বলা হচ্ছে) আর সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী সীরাতুল মাহদী'র প্রথম খণ্ডের ৭৫ নম্বর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার গুজরাত-এ বসবাসকারী এক গোঁড়া হিন্দু কাদিয়ান এসেছিল আর সে হিপনোটিজম বা সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওপর নীরবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে যেন তাঁর মাধ্যমে কোন অশোভন আচরণ করিয়ে তাঁকে মানুষের উপহাসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তিনি (আ.) যখন তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন সে চিৎকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কী হয়েছিল? সে উত্তরে বলে, আমি যখন মির্যা সাহেবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি তখন আমি দেখতে পাই, আমার সম্মুখে এক হিংস্র সিংহ দাঁড়িয়ে আছে যে আমার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত, আর আমি এর ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাই। তিনি (রা.) লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো মহানবী (সা.)-এর সেবক মাত্র, যখন সেবকেরই এরূপ মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁর ওপর আল্লাহ্ তা'লা সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব পড়তে দেন নি, সেখানে মনিব সম্পর্কে এই ধারণা করা, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা মনে করা যে, তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ এক ইহুদীর সম্মোহন বিদ্যার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন, এটি কীভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? **(১৯৫৯ সালে প্রকাশিত মাযামীনে বশীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪২-৬৫৩ দ্রষ্টব্য)**

পরিশেষে যুগের হাকাম এবং আদল-এর এ সম্পর্কিত উদ্বৃতি পাঠ করছি যা সকল ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণকে পরিবেষ্টন করেছে।

একজন তাঁর (আ.) বৈঠকে প্রশ্ন করে, মহানবী (সা.)-এর ওপর কাফিররা যে জাদু করেছিল সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "জাদুও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। রসূল এবং নবীদের ওপর জাদুর প্রভাব পড়া তাঁদের মর্যাদা পরিপন্থী। বরং তাদেরকে দেখে জাদু পলায়ন করে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (সূরা তাহা: ৭০)।" অর্থাৎ "দেখ! হযরত মূসা (আ.)-এর বিপরীতে জাদু ছিল, অবশেষে মূসা (আ.) বিজয়ী হয়েছেন, নাকি হন নি? এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, মহানবী (সা.)-এর বিপরীতে জাদু প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা কখনো এটি গ্রহণ করতে পারি না। চোখ বন্ধ করে বুখারী এবং মুসলিমকে গ্রহণ করে নেয়া আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এটি তো মানুষের বিবেকও গ্রহণ করতে পারে না যে, এমন উন্নত পর্যায়ের নবীর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে। এই জাদুর প্রভাবে (নাঊযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা.)-এর স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছিল, আর এটি হয়েছিল, সেটি হয়েছিল- এসব কথা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মনে হয় কোন কুচক্রী ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে এসব কথা রটিয়েছে। যদিও আমরা হাদীসকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে হাদীস পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ও মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতার বিরোধী, সেটিকে আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি! তখন হাদীস সংগ্রহের সময় ছিল। যদিও তারা," (অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহকারীরা), "অনেক ভেবেচিন্তে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে পুরো সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন নি।" (অনেক সতর্ক থাকার পরও) "তখন হাদীস সংকলন করার সময় ছিল, কিন্তু এখন গভীর প্রণিধান এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করার সময়।" গভীর দৃষ্টি দাও আর প্রণিধান

কর। কোন হাদীস যদি পবিত্র কুরআন অথবা মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতার বিরোধী হয় তাহলে তা বর্জনীয়। অথবা তার ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা রয়েছে। (যেমনটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) করেছেন বা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) করেছেন)। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহনাবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলী একত্রিত করা অনেক বড় পুন্যের কাজ"। (নবীদের জীবনের ঘটনাবলী এবং তাদের কথা সংকলন করা অনেক পুণ্যের কাজ)। "কিন্তু এটি একটি নীতিগত কথা যে, সংকলনকারীরা গভীরভাবে প্রণিধান করতে পারে না। এখন প্রত্যেকের গভীরভাবে প্রণিধান করার ও ভাবার অধিকার রয়েছে। আর যেগুলো গ্রহণযোগ্য সেগুলোকে গ্রহণ করে আর যেগুলো পরিত্যাজ্য সেগুলোকে পরিত্যাগ করে। এমন কথা বলা, (নাঊযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছিল, এতে তো ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।" তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا **(সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৮)**"। অর্থাৎ যখন দুষ্কৃতিকারীরা বলে, তোমরা কেবল এমন এক ব্যক্তির অনুবর্তীতা করছ যে জাদুগ্রস্ত, যার ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে বা যে জাদুর প্রভাবাধীন, "এমন কথা যারা বলে তারা মুসলমান নয় বরং যালেম বা দুষ্কৃতকারী। এটি অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতকারীদের কথা যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর (নাঊযুবিল্লাহ্) জাদু-টোনার প্রভাব পড়েছিল। তারা এতটুকুও চিন্তা করে না, (নাঊযুবিল্লাহ্), মহানবী (সা.)-এর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তাঁর উম্মতের কী অবস্থা হবে? তারা তো তাহলে পুরোপুরি নিমজ্জিত হবে। জানি না এদের কী হয়েছে, যে নিষ্পাপ নবী (সা.)-কে সকল নবীগণ শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র মনে করে আসছে, (অথচ) এরা তাঁর (সা.) নামে এমনসব কথা বলে! **(মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৭১-৪৭২)**

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যুগ ইমামকে মানার কারণে মহানবী (সা.)-এর মাকাম এবং পদমর্যাদা বুঝি এবং অনুধাবন করি।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ থেকে ২৯ মার্চ, ২০১৯, পৃ: ১৩-১৭)
(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)